Kinjal - Probandho - Others - Bangaler Ragsangit O Tar Bhabisayta - Rajyswar Mitro

কিঞ্জল - বাংলার রাগসঙ্গীত ও তার ভবিষ্যৎ - রাজ্যেশ্বর মিত্র

(বাংলার রাগসঙ্গীত ও তার ভবিষ্যৎ - রাজ্যেশ্বর মিত্রের এই লেখাটি কিঞ্জলের - ১৯৮৯ বাংলা গান সংখ্যা হইতে নেওয়া হয়েছে)

আজকাল অনেকে আমার কাছে কথা প্রসঙ্গে বলেন যে পুরাতন বাংলা গান আবার শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কথাটা কতখানি সত্যি এবং কোনদিক থেকে সত্যি সেটা ভেবে দেখা দরকার। যাত্রাও তো এযুগে খুব জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু সেই জনপ্রিয়তার নিদর্শন কি? যাত্রা যে আজকাল জনপ্রিয় হচ্ছে সেটা আধুনিকতাকে অনেকখানি আত্মসাৎ করেই হচ্ছে এবং সে আধুনিকতা যে আর্টের দিক থেকে আদৌ সার্থক তা অনেকেরই মনে হবে না। এর কারণ, যাত্রার সেই চিরন্তন অতি নাটকীয়তা, সেন্টিমেন্টের আধিক্য এবং বিষয় বিন্যাসের দুর্বলতা- কোনক্রমেই পূর্বতন ধারা থেকে উন্নতিলাভ করেনি। কিন্তু এমন কয়েকটি জিনিষকে অধিকার করেছে, যা জনপ্রিয়তাকে সহজেই লাভ করবার পথ করে দিয়েছে। আজকাল যাঁরা পুরাতন বাংলা গান করেন তাঁরাও একই পন্থাস অনুসরণ করেছেন, অর্থাৎ কতকগুলি নাটুকেপনা লঘু খেমটার চমক দিয়ে তাঁরা শ্রোতাদের চিত্তকে হরণ করতে চেষ্টা করছেন। আসল সুরের কাজ বা কাব্যের চমৎকারিত্ব তাঁদের গানে প্রায়ক্ষেত্রেই প্রতিভাত হয়না। তাঁরা যেমন জনপ্রিয় হয়েছেন তেমন সু-প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলির সমালোচনায় তাঁরা এরই মধ্যে নিন্দিত হতে শুরু করেছেন। এমন হলে পুরাতন বাংলা গান তার যে ক্ল্যাসিকাল রীতি তাঁর থেকে সরে গিয়ে আর একটা চটকদান্দর ব্যাপারে পরিণত হবে। আসল কর্তব্য যে সত্য বস্তুকে রক্ষা করা এবং সত্য বস্তুর সৃষ্টিতে অগ্রসর হওয়া এটা আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছি।

পুরাতন বাংলা গানের পিছনে কোন চিন্তা কার্যকর হয়েছিল সেটা ভেবে দেখা দরকার। ব্রিটিশ শাসনের অব্যবহিত পূর্ব বাংলায় কদাচিৎ ধ্রুপদ গাওয়া হতো, তাও বহিরাগত মুসলমান গায়কগণ বড় বড় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের আয়োজিত আসরে গাইতেন। সে ধ্রুপদ বঙ্গ সমাজে বড় একটা ছাপ ফেলতে পারেনি। সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল পয়ার ছন্দে রচিত পদাবলী এবং দেবতাদের নামাঙ্কিত ভক্তিগীতি। এর মধ্যে রামপ্রসাদ একটা জনিপ্রিয় গীতির প্রবর্তন করেছিলেন, যাকে ঠিক রাগ সংগীতের আওতায় ফেলা যায় না। পলাশীর যুদ্ধের পর যখন কলকাতার ভাল কন্দের গোড়াপত্তন হলো তখনপ্রচারলাভ করলো কবিগান, কেউড়, পাঁচালি - এইসব। অবশ্য যাত্রাগান আগে থেকেই ছিল কিন্তু ইদানীং তার গানে সংযুক্ত হলো খেমটার রীতি, যার কাব্যগত ঐতিহ্য হচ্ছে খেউর এবং সুরের দিক থেকে চটুল ঢঙ্। যেটা অনেকটা দাদরা ঠুংরীর মতো। এই খেউরকে কিন্তু নিতান্ত অশ্লীল বলে অগ্রাহ্য করা চলে না, এগুলির মধ্যেও যথেষ্ট কাব্য সম্পদ ছিল। তবে সেগুলি প্রধানতঃ অশিক্ষিতদের মদ্যে পড়ে প্রায়ই অশোভনভাবে প্রকাশিত হতো।

আমরা সাধারণতঃ উনবিংশ শতাব্দীকেই সংগীতের নবজাগরণের যুগ বলে নির্দেশ করি; কিন্তু আসল আন্দোলনটা ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীরই শেষার্ধ ভাগে। এই সময় কলকতায় ক্রুমেই ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি বিভিন্ন পশ্চিম ও উত্তর বারতীয় ধারার প্রবর্তন হতে থাকে। বাংলার গায়কগণ এগুলি শিখতে গিয়ে দেখলেন এদের আয়ন ছোট অথচ লিরিকের আকার বজায় আছে এবং সবচেয়ে যেটা তাদের মনে ধরল সেটা হচ্ছে, এসব গানে রাগের মাধ্যমে একটা সাজেসটিভনেস্; ক্রমে টপ্পার আমদানী যখন হলো তখন দেখা গেল দুলাইনেও একটা সম্পূর্ণ গানের আকৃতিতে তৈরী করা অসম্ভব নয়। তাঁরা ধীরে ধীরে হিন্দীগান আয়ত্ত করতে চেষ্টা শুরু করলেন, কেউ কেউ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানেও যেতেও দ্বিধা করলেন না। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর আগেই বাংলায় একটি গোষ্ঠীর গোড়াপত্তন হলো যাঁরা হিন্দী রাগসঙ্গীত যথেষ্ট পটুত্ব ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এঁরা প্রধানতঃ কলকাতাতেই বাস করতেন এবং বড় বড় লোকদের পৃষ্টপোষকতায় সংগীত চর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমরা অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত বাঙালি গায়কদের নাম খুব কমই জানি কিন্তু তাঁদের সংখ্যা যে নেহাৎ নগণ্য ছিল এমন নয়। এইভাবেই সঙ্গীতের অভ্যাস চলছিল কিন্তু দু - একজন অসাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তি নিজের মাতৃভাষায় এই ধরণের গান রচনার জন্য বিশেষ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এঁদের মধ্যে দুজন স্বনামধন্য গীতিকার হলেন রাধামোহন সেন এবং রামনিধি গুপ্ত। রাধামোহন সেন ছিলেন একাধিক ভাষাবিদ্ পন্ডিত ব্যক্তি এবং রামনিধি গুপ্তও যদিও খ্যাতিলাভ করেছিলেন তথাপি নিধুবাবুর তুল্য অসাধারণ গৌরবের অধিকারী তিনি হতে পারেননি; তবে কাব্যগত পরিশীলনের দিক থেকে উভয়েই প্রায় সমান ছিলেন। নিধুবাবু বাইরের থেকে রাগংসগীতে কয়েকটি ধারা আয়ত্ত করেন, তার মধ্যে টপ্পায় তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁর আয়ত্ত করা তাবৎ গানই ছিল হিন্দীতে রচিত এবং টপ্পার ভাষা ছিল পাঞ্জাবী। কলকাতায় তিনি যখন জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তখন কবিগানের যুগ চলছিল। নিধুবাবু কবিগানের দিকে আদৌ ঝোঁকেননি, কারণ তাঁর রুচি ছিল অনেক পন্দিরমার্জিত। যে কোনো কারণেই হোক নিধুবাবু হিন্দী গ্লান বা পাঞ্জাবী টপ্পা করে তৃপ্তি পাননি; তাঁর ধারণা হলো যে বাংলায় রাগসংগীত রচনা করতে না পারলে তাঁর অন্তর ঠিক যে বস্তুটা দিতে আগ্রহী তা দিতে সমর্থ হবে না। তিনি প্রথমটা উত্তর ভারতীয় সংগীতের আদলে বাংলাগান রচনা ককতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই একটি স্বকীয় রীতি স্থাপন করতে সমর্থ হলেন যাতে তাঁর মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রস্পটিত হবার সুযোগ পেল। এটুকুই সব নয়, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দীগানের গায়কী হুবহু বাংলাগানে আরোপ করলেন সেটা একটা নকল জিনিষ হয়ে দাঁড়াবে, তাই তান বিস্তারে তিনি বাংলার সেন্টিমেন্টকে এমনভাবে জাগিয়ে তুললেন যে তাঁর সৃষ্টি সর্বতোভাবে একটি নতুন রচনা বলে গণ্য হলো এবং যে রীতি তিন্দ্রনি স্থাপন করলেন তাকে বাংলারীতির রাগসংগীত বলতে কারুর মনে দ্বিধা রইল না। মূল কথা হচ্ছে এই যে তিনি দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিলেন যে যতই পরভাষায় গান হোক না কেন নিজের ভাষায় নিজের সৌন্দর্যবোদেব সঙ্গে গান রচনা করতে না পারলে সে সৃষ্টি কোনো স্বকীয় মূল্য থাকবে না। এটা ক্লিন্তু বিচ্ছিন্নতার মনোভাব নয়। অর্থাৎ ভারতীয় সংগীতকে পরিহার করে কেবল বাংলার সঙ্গীত শিল্প গঠন করা হোক এরকম চিন্তা তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, পরভাষায় উন্নত সংগীতের যথারীতি চর্চা হোক। কিন্তু মাতৃভাষাও কোনক্রমে দরিদ্র নয়, তাকেও নিজস্ব রীতিতে সমৃদ্ধি লাভ করতে হবে। তিনি শুধু যে কিছু গান রচনা করেছিলেন তাই নয়, এই রাগসঙ্গীতে জলসান্দর প্রবর্তনও তিনিই করেছিলেন। এর নাম ছিল আখড়াই সংগীত। বড় বড় গাইয়েরা এই আখড়াই গানে যোগ দিতেন এবং এঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলতো।

এইভাবে বাংলার সংগীত যে নতুন চিন্তা সূত্রপাত হলো, তার ফলে বিভিন্ন ভঙ্গীতে বহুতর গান রচিত হতে লাগল যাদের মদ্যে বাংলার একটা স্টাইল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাবে প্রতিফলিত হতে লাগল। দেখা গেল হিন্দী এবং বাংলা - দুটি গানের ক্ষেত্রে রাগ এক হলেও গায়কীতে বেশ খানিকটা তফাৎ রয়ে গেছে। এইখানে কৃতিত্বের বিষয় এই যে এই নতুন দেশীরীতির রাগসংগীত সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে প্রতি,ঠালাভ করতে সক্ষম হলো।

পুরো এক শতাব্দী ধরে চলেছিল এই প্রচেষ্টা যাতে বাংলার একটা রাগসংগীত দৃঢ়ভাবে আমাদের কালচারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। বর্তমান শতাব্দীতেও এই ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তি বহন করে এনেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, এমনকি নজরুলও এই ঐতিহ্যকে পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী বড় বড় আসরে সর্বভারতীয় ওস্তাদগণেক সামনে প্রচন্ড দাপটে গাইতেন এই ধরণের বাংলার রাগ সংগীত। ভীষ্মদেবও এই চর্চা রেখেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারাপদ চক্রবর্তীও এই ধারাকে অব্যাহত রেখে যাবার চেষ্টা করেছিলেন।

মনে দেখতে পাচ্ছি এই চিন্তার কোথা থেকে যেন একটা ছেদ পড়তে শুরু করেছে এবং বাঙালি তার ঐতিহ্য সম্বন্ধে উদাসীন্য প্রকাশে কোনও সংকোচ বোধ করছে না। কেন এমন হলো সেই প্রশ্নটা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলেন্দ্বাচনা করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দৰক থেকে পন্ডিত ভাতাখন্ডে প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রসার ঘটতে থাকে এবং কিছু কিছু বাঙালি তরুণ লখনই -এর ম্যারিস কলেজে শিক্ষা লাভ করতে শুরু করেন। তাঁরা কৃত্তিত্বের সঙ্গেই রাগ সঙ্গীত গাইতে শিখেছিলেন এবং তাঁদের গায়ন পদ্ধতি প্রশংসা অর্জন করেন্দ্রছিল। তাঁদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশে এই শিক্ষাপদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ল। এই মূল আদর্শ হচ্ছে একেবারে গোড়া থেকেই টেকনিক্যাল পদ্ধতিতে সংগীত শিক্ষা। এই পদ্ধতিতে সারেগামা শেখবার পরেই একটি রাগ আয়ত্ত করা হয় 'লক্ষণগীত' - এর মাধ্যমে। ভাতখন্ডে রাগের আলোচ্য রাগ সম্বন্ধে একটা ধারণা গঠিত হতো। তারপরেই একেবারে হিন্দী ধ্রুপদ, খেয়ালে প্রভৃতিতে চলে যাওয়া হতো। এটা রাগসংগীত শেখবার পক্ষে সুবিধাজনক হলেও শিক্ষার্থীর কাছে সংগীত একটা টেকনিকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত এবং যেসব হিন্দী গান তাঁরা শিখতেন তাদের গাইএয় করবার পক্ষে সবরকম কায়দাকানুন সরবরাহ করলেও এই শিক্ষা তাদের আর্টিষ্ট বা মরমী শিল্পীর করবার পক্ষে আদৌ যথেষ্ট ছিল না। অপর পক্ষে এর আগে বাঙালি ছেলে মেয়েরা বাংলার রাগসংগীত দিত সংগীত শিক্ষা আরম্ভ করত। আমরা যখন ইমন শিখি তখন 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে' -গানটি ছিল স্ট্যান্ডার্ড। এইরকম বিভিন্ন রাগ বিভিন্ন রচয়িতার বাংলা গান থেকে শেখানো হতো.। যে শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা অল্প বয়স থেকে বাংলাগানকে ভালবসতে শিখত, তাদের কাব্যবোধ জাগ্রত হতো এবং বাংলার বিরাট সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় অক্ষুণ্ণ থেকে যেতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ক্রমে ক্রমে এ রীতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। তারহ কারণ পশ্চিমী ডিগ্রী উপাধিগুলির প্রতি আকর্ষণ, কেননা তাদে ভবিষ্যতে অর্থোপার্জনে সুবিধা হয়। এখন দেখা যায় ছেলেমেয়েরা একেবারে হিন্দীভাষার মাধ্যমে রাগসংগীত শিখতে আরম্ভ করেছে এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বাংলার যে

একটা সংগীতের ঐতিহ্য রয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনো ধারণা নেই, এমন কি জাগ্রত নেই। তার গান শিখছে বটে কিন্তু কাব্য বোধ তাদের মধ্যে আদৌ আগ্রহ হচ্ছে না। তারা নানারকম গলার কৌশল শিখছে কিন্তু আর্টকে জাগিয়ে তুলতে পারছে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ওস্তাদো এইটা ভাল করেই উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তারা দুধর্ষ কালোয়াৎ হয়েও বাংলা গান রচনায় আগ্রণী হয়েছিলেন এবং সেই প্রচেষ্টায় তাঁরা কাব্যের আবেদনও জাগতিক মনোভাবকে সর্বাধিক প্রাধান্য অর্পণ করেছিলেন। তাঁদেরই পরবর্তী প্রজন্ম এই সহজ সত্যকে মনে রাখলে না। এবং সম্পূর্ণভাবে খ্যাতি কতটা হয়েছে জানিনে, তবে সর্ববঙ্গীয় খ্যাতিও যে তাঁদের এমন কিছু হয়েছে, তা আমাদের মনে হয় না।

আজকাল 'রাগপ্রধান' নামক একটি সংগীতের রীতি চালু করা হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাভাষায় রাগসংগীত রচনা করা। কিন্তু যারা বংলা গানের ঐতিহ্য কিছু মাত্র জানেনা তাদের পক্ষে একাজটা করবার একটামাত্র সহজ উপায় আছে, সেটি হচ্ছে একটি হিন্দী গানের ছসে বাংলাগানকে দাঁড় করানো; অর্থাৎ কবিতাটা বাংলা ভাষায় হলেও সেটা হবে ঠিক হিন্দী গানের ভাবান্তর। এতে কোন রসই ফোটানো হচ্ছো না। এর প্রয়োজনীয়তা একমাত্র রেডিওর প্রোগ্রাম সার্থক করা ছাড়া আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। বাঙালি গায়কেরা৪ আজ বড় বড় সর্বভারতীয় আসরে বাংলা রাগসংগীত গাইতে লজ্জাবোধ করেন কারণ সেখানে সাত নকলে আসল খাস্তা হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

আরা যদি আমাদের ঐতিহ্যকে নষ্ট হতে না দিতুম তাহলে এমনটা হোত না। আমরা যে কাজটা করেছি সেটা আমর কোথাও হয়েছে কি? যেমন ধরুণ ইংরাজী পাঠে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি শেক্সপীয়রের যুগ থেক্সেক গড়ে ওঠা হারানো ইংরাজী সাহিত্যকে বর্জন করে কেবল বর্তমানকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি তাহলে ইংরাজীতে কথা বলতে কি লিখতে আমাদের অসুবিধা হবে না, কিন্তু ভজনভান্ডার অত্যন্ত সীমিত এবং সঙ্গুচিত হয়ে যাবে না কি? যেরকম ইংরাজী শিক্ষার কোন মূল্য নেই। অথচ তাতে কেরানী হতে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। সংগীতেব ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই আমাদের ছেলেমেয়েরা ওস্তাদ হয়েছে কিন্তু শিল্পী হয় নি। এই যে বিরাট ট্রাজেডি, এ থেকে অব্যাহতি পেতে হলে আমাদের বাংলা গানের কথা ভাবতে হবে, তার এমন রূপায়ণ করতে হবে যাতে আমাদের কালচার প্রতিফলিত হয় এবং বাঙালি তাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধায় বরণ করে নিতে পারে। আজকে যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে একাজ করা সহজ সাধ্য নয়। একমাত্র অসামান্য প্রতিভাই এই সৃষ্টির কাজে এগিয়ে আসতে পারেন, তার দর্শন যে মিলেছে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমার জীবনের শেষপ্রান্তে এসে বাংলার সংগীতের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে এই সাবধানবাণীর উচ্চারণ করতেই হচ্ছে, নইলে বাংলাগানকে নিয়ে ভবিষ্যতে গর্ব করার খিছুই থাকবে না।

Kinjal - Probandho - Others - Addai Janosanyaga - Chandranath Chattpadhyay
কিঞ্জল - আড্ডায় জনসংযোগ - চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(আড্ডায় জনসংযোগ - চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের -এই লেখাটি কিঞ্জলের - ১৯৯৮ জণসংযোগ সংখ্যা হইতে নেওয়া হয়েছে)

পুর ছাড়া যেমন সিঙ্গারা হয় না, আড্ডা ছাড়া তেমনি জনসংযোগও ভাবা যায় না। আড্ডা হচ্ছে জনসংযোগের এক প্রধান মাধ্যম। আড্ডার সম্পৃক্ততা বহুযাগের। সকালের বাজার থেকে রাতে স্বাস্থ্যকারী পানীয় সবই আড্ডার ফসল। সকালে থলে হাতে বাজার গেলাম। একগাল হেসে মেছোবাবা আপ্রায়ণ করলো - এতদিন কোথায় ছিলেন। একথা সেকথার পর সবচেয়ে খারাপ মাছটি গছিয়ে দিল ষাট টাকা কিলোয়! পকেটের পয়সা ক্রমশ কমে এলো। মুদির দোকানে গেলাম। ছোট পাউচে ইনস্ট্যান্ট কফির প্যাকেট বেরিয়ে গেছে। দু'প্যাকেট গছিয়ে দিল। দশ টাকা খসে গেল। বিজ্ঞাপনের হাই - কিক্। গিন্নিদের আড্ডায় আবিস্কৃত হয়েছে এই কফি করার জন্য সময় লাগে কম। বাসে করে অফিস ছুটবো। ধীর গতিতে মিনিবাস ছুটছে। অবিশ্রান্ত গালি উপচে পড়ছে কন্ডাকটারের উদ্দেশ্যে। মাথা ঠান্ডা রেখে সে অগণিত যাত্রী তুলে যাচ্ছে। পিছন দিয়ে এগিয়ে যান দাদা। খালি আছে।

হাই - টেক বিজ্ঞাপনের গুঁতোয় আমরা আজ সবাই পিছন দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। পরনির্ভরতা ক্রমশঃ বাড়ছে। জনসংযোগ গ্রাস করে নিচ্ছে ঘরের সুখ। স্থানভেদে কালভেদে আড্ডারও চিত্রের অনেক ফারাক। উত্তর কলকাতার নাকুমেসো ভোরবেলা বাজারের থলে হাতে বার হলেন মর্নিং ওয়াকে। হাঁটুর কাছে ধুতি। পায়ে মোজা, গায়ে তুষ। মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ। দেশবন্ধু পার্ক ঘুরে, বাজার সেরে বাড়ি। বাজারে দেখা হলো পরিতোষের সঙ্গে। আরে দাদা এখানে কেনন কপি কিনছো - ছাতুবাবুর বাজারে যাও আট আনা সস্তা পাবে। আর শোন তোমার ভাইপোকে বলো একটা এসে যদি আমার ছেলেটাকে একটু অঙ্কটা দেখিয়ে দেয়। সামনে পরীক্ষা - জনসংযোগ হয়ে গেল। উত্তরে বেতো বিবিরা দুপুরে রসুন তেল মালিশ করতে করতে পাশের বাড়ির পারুল কাকীর সঙ্গে জনসংযোগ করে - জানিস তো ট্যাপার বই কমলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। সবে বিয়ে হল ছেলেটার। কী ভাগ্য! পারুল কাকী সঙ্গে সঙ্গে সম্বন্ধ করে - তা টাঁপাকে বলো না অনিমার মেয়েকে একবার দেখতে। বেশ ভাল মেয়েটা। দুজনের মানাবে ভাল। উত্তর কলকাতার বেকার যুবকদের জনসংযোগের প্রধান মাধ্যম হলো রক অথবা হরির চায়ের দোকান। ও বাড়ির বুড়ি ঠাকুমার গঙ্গা প্রাপ্তি হয়েছে সঙ্গে আট বাহক হাজির কাঁধে গামছা ফেলে। হাবুলদাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। হাজির জনসংযোগকারীরা। ও পাড়ার নয়নার বিয়ে, কোমরে গামছা হাজির সবাই। কলাপাতা পেতে, খাবার বেড়ে চারশো লোক খাইয়ে ছেড়ে দেবে। এদের কোন হোটেল ম্যানেজমেন্টের তকমা আঁটা নেই। গণসংযোগই এদের প্রধান কর্ম। আন্তরিকতার ধর্ম দিয়ে এদের জীবনযাত্রা মোড়।

দক্ষিণ কলকাতার চিত্রের সঙ্গে এ চিত্রের অনেক ফারাক। সেখানে জীবন দশ বাই দশ ফুটের দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাটে আবদ্ধ। এ ফ্ল্যাটের লোক পাশের ঘরের খবর রাখে না। সকালে বালিগঞ্জ লেকের ধারে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছুটছেন। সঙ্গে ছুটছে তার আহ্লাদে গদগদ পৃথুলা বিবি। পেছনে জগিং করছে কোম্পানীর মেজবাবু, সেজবাবু, ছোটবাবু, চোটবাবু, মেজবাবুকে ল্যাং মেরে এগিয়ে গেল। ছুটন্ত এম. ডি. খুশি। জনসংযোগ হয়ে গেল।

জনসংযোগ পেশায় থাকতে গিয়ে বার বার মনে হয়েছে এদেশে প্রকৃত জনসংযোগ কী ? প্রত্যেক মানুষই বুদ্ধি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। প্রত্যেকেই বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবী বলে যেমন কোন আলাদা শ্রেমী হয় না। তেমনি প্রত্যেক মানুষই জনসংযোগকারী। আলাদা করে জনসংযোগকারী শ্রেনি কেন? এটা একটা তকমা এঁটে নিজেদের জাতে তোলার চেষ্টামাত্র। আমরা জনসংযোগ আধিকারিক। রেশমীচুড়ি মতো বাহারী। চকচকে। একটু ধাক্কা লাগলেই ভেঙে খানখান। এখানের অধিকাংশ জনসংযোগ বিভাগই শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন বিভাগ হিসেবে কাজ করে। এখানেই আমাদের ব্যর্থতা। পুরাকালে রাজা মহারাজারা মাইনে দিয়ে ঢাকী রাখতেন। তাঁদের অনেক রকম উপাধি দেওয়া হতো। সভাকবি, বিদুষক, এখন সে রাজাও নেই, রাজ্যও নেই। ঢাকী কিন্তু রয়ে গেছে। সরল ভাষায় তাদের বলা হয় 'চামচা'। রাজার বাণিজ্য তরী এখন কর্পোরেট অফিসের হয়ে ঢাক পেটাচ্ছে। অনেকে অবশ্য নিজের ঠাক নিজেই পেটান। এটা একদিক থেকে

ভাল। যারা নিজের ঢাকে জোর আছে সে বাজাবেই। তবে অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁরা নিজেদের প্রচ্ছন্ন রেখে জোর কদমে অম্লানবদনে অন্যের ঢাকে বোল তুলে যান। চোরাঢাকী।

বাঙালির আর এক প্রধান জনসংযোগ পুজো। সেও তো আড্ডারই ফসল। ছিল বারো ইয়ার। তৈরি হলো বারোয়ারী। শুরু হলো সার্বজনীন পুজো। অবাধ মেলামেশা। পণ্যের বিপণন টু রাজনৈতিক পুস্তিকা। লেটেস্ট ডিজাইনের শাড়ি থেকে নেতাদের ফিতে কেটে মূর্তির আবরণ উন্মোচন। আড্ডার মাধ্যমেই খুলে গেল বিস্তৃত জনসংযোগের দিগন্ত। ধর্মের মাধ্যমে যত বেশি জনসংযোগ করা যায় আর অন্যকোনও মাধ্যম কি এত লোকের একসঙ্গে মেলবন্ধন ঘটতে পারে। পুরাকালের কাহিনীগুলো পড়ুন। ধর্মগুরুই তখন একমাত্র চিফ ম্যানেজার পাবলিক রিলেশনস। শ্রীকৃষ্ণ, নারদ এঁরা তো নস্য জনসংযোগবিদ্। ক্রীড়জগতের যেমন শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জুন পুরুস্কার, তেমনি অবশ্যই জনসংযোগে উৎকর্ষতার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বা নারদ পুরুস্কারের এখনই প্রবর্তন হওয়া উচিত। রাজঅন্তঃপুরে রানিদের ছিল জনসংযোগ আধিকারিক মহিলারা। তাদের বলা হতো দৃতী। তারা ছিল রাণীদের আড্ডার সঙ্গী। আবার গোপন অভিসারের প্রধান সাক্ষী। এখনো কোম্পানির অনেক গোপন খবরই জনসংযোগ অধিকারিকই প্রথম খবর পান টপ ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে।

জনসংযোগও যেমন বিভিন্ন মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল। আড্ডাও তেমনি কয়েকটি মাধ্যমের উপর নির্ভর করে। পাড়ার রক, পাড়ার চায়ের দোকান, কলেজ ক্যান্টিন, কফি হাউস, ক্লাব ইত্যাদি। কফি হাউসের কথা ধরা যাক। কলকাতা শহরে তখন দুটো কফি হাউসল (এখন অবশ্য যাদবপুর অঞ্চলে একটি হছেয়ে) গমগম করে চলতো। একটি ধর্মতলায় ভিকটোরিয়া হাউসের পিছনে, অন্যটি জনপ্রিয় কলেজ স্ট্রিটে। শিল্প - সংস্কৃতির আঙ্গিনার মানুষেরা ভিড় করে থাকতেন এই দুটি হাউসে। কালো কফি, চারমিনার সিগারেট আর আড্ডা। জনসংযোগের এ্যাহস্পর্শ। ধর্মতলায় যখন আড্ডা মারতে ভিড় করছেন সত্যজিৎ রায়, হরিসাধন দাশগুপ্ত, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, কলেজ স্ট্রিট তখন কাঁপছে সুনীল গাঙ্গুলী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আড্ডায়। এই আড্ডা থেন্সেক জন্ম নিয়েছিল কালজয়ী বাংলা চলচ্চিত্র পথের - পাঁচালী। কবিদের নিজস্ব পত্রিকা - কৃত্তিবাস। এই দুটি কফি হাইসের তখন নামকরণই হয়ে গিয়েছিল হাউস অফ লর্ডস আর হাউস অফ কমনস্।

প্রত্যেক ব্যবহারজীবীর নিজস্ব আড্ডার ঘরানা আছে। হাইকোর্টের সঙ্গে লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের মিল নেই। কিন্তু আড্ডা তো! দুজনেই জনসংযোগ করেছে। নৃত্যশিল্পীদের আড্ডার সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পীদের আড্ডার গন্ধ আলাদা। অমুকদা, ভাল প্রাডিউসার। ডাকলাম রাতের আড্ডায়। রাত গভীরতর হলো। দাদার পরবর্তী ছবিতে সেকেন্ড হিরো'র কাজ পেলাম। তমুকবাবু নামকরা অনুষ্ঠান - আয়োজক। - ডাক দাও রাতের ডিনারে। অনুষ্ঠানের অভাব হবে না। এও তো আর এক ধরণের জনসংযোগ। আড্ডার পেশাগত জনসংযোগ। শিল্প সৃষ্টির জনসংযগো।

গণমাধ্যমের আর এক বলিষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে, পরিভাষায় যাকে বলে 'হুইসপারিং ক্যাম্পেন' (Whispering campaing)। এই হুইসপারিং ক্যাম্পেন তো একমাত্রা আড্ডার ম্যাধ্যমেই সম্ভব। আপনি চুপি চুপি একটি গোপন কথা ছাড়লেন আড্ডাবাজাদের মধ্যে - 'জানিস তো অমুক কোম্পানীর দাঁর মাজার ব্রাশ কিনলে একটি খাঁটি রূপোর পয়সা ফ্রি দিচ্ছে।' অথবা, 'পাশের গলির জগাবাবু গোপনে দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন'। দেখবেন দু'ঘন্টা বাদে এই খবরই প্রতিবেশী পাড়ার আর এক আড্ডাবাজ নিমাই এসে আপনাকে চুপি চুপি জানাচ্ছে। আপনারই খবর অন্য লোক মারফৎ ফিরে এলো আপনারই কাছে।

বিশাল পালঙ্কের উপর ছড়ানো দুটো উপন্যাস। পাশে রূপোর থালায় পেতলের জাঁতি, পানের ডিবে, দশ পনেরোটা ছোট বড় বাটি সাহানো, যেমন জল - তরঙ্গর বাটি সাজানো। কৌট ভর্তি পানের মশলা। গিন্নি জাঁতি হাতে সুপারি কেটে চেলেছেন। পাশের বাড়ির সই হেমলতা আসন বুনছে। আসনে লেখা - পতির পূণ্যে সতীর পূণ্য। আর চলছে পরচর্চার আড্ডা। বাবুরা বারমহলে দাবা খেলায় ব্যস্ত। বাবু কলকাতার এ চিত্র এখন শুধু ফ্রেমেই বন্দি। তখন পানের বাটা ছিল মহিলা মহলের স্ট্যাটাস সিম্বল। বিস্তিখেলা। কাঁথা সেলাই, পরচর্চা ছিল আড্ডার সরঞ্জাম। এখন দিন বদলেছে। টু-ইন-ওয়ান সংসার, দোমহলা যৌথ পরিবারের বাড়ি এখন ইঁদুরের গর্তে র মতো দশ - বাই দশের ফ্ল্যাটে দিনে আড্ডা মানে অন্য। আগেকার দিনের ছুটির দিন ছিল বিলম্বিত লয়ে চলা ধ্রুপদী সংগীত। এখন ছুটির দুপুরমিানে রক্ এন্ড রোল। সন্ধ্যে হলেই ক্লাব কালচার। বিবিদের পরনিন্দার কাজিয়া ছেড়ে বাবুরা ডুবে যায় ছোট ছোট মদিরার পত্রে। কোনক্রমে বেতাল পায়ে বাড়ি ফেলা। বাবুদেরও এি বেতাল পায়ে হাঁটাটা বদলায় নি। কালে কালে একই রয়েছে। শুধু ঘরানা বদলেছে। আগে ছিল বারমহলে বসে ইয়ারদের সঙ্গে সুরা পান। একটু বড় ধরণের বাবু সঙ্গে রাখতেন পিয়ারীবাঈ -এর গান আর নাচ। সুরা আর নাচ একই রয়েছে। শুধু 'মহল' ধ্বসে গিয়ে 'বার' রয়ে গেছে।

এখন বারমহলের ঘুঙুরের আওয়াজ। অন্দরমহলের পানের বাটা সহযোগে আড্ডার জনসংযোগ শুধুই স্মৃতি। কেবলই ছবি।